হিউম্যান বিয়িং

শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব

হিউম্যান বিয়িং

শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব

গ্রন্থনা
ইফতেখার সিফাত

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

নাশাত

হিউম্যান বিয়িং
শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব
লেখক : ইফতেখার সিফাত
সম্পাদক : মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

প্রথমপ্রকাশ-আগস্ট ২০২০
তৃতীয়মুদ্রণ-জুন ২০২১

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭১০৫৬৪৬৭১, ০১৭১২২৯৮৯৪১
প্রচ্ছদ : হামীম কেফায়েত
স্বত্ব : সংরক্ষিত

মূল্য : ২২০ (দুইশত বিশ) টাকা মাত্র

উৎসর্গ

মুফতি মাহবুবুর রহমান, মুফতি হামিদুর রহমান এবং প্রিয় আহমাদ আলী নাজমী স্যার। বাবা মায়ের পর আমার দীনি জীবনের নানা ক্ষেত্রে এই তিনজন মানুষের মৌলিক অবদান অনেক। একজন আমার ইলমি পথ সুগম করেছেন, অপরজন আমার ফিকরি সফরের পাথেয় যুগিয়েছেন। আরেকজন আমার লেখার হাতেখড়ি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাদের সকলকে উপযুক্ত বদলা দান করুন এবং সত্য পথের পথিক হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

ইফতেখার সিফাত

নাশাত-এর আরও কিছু বই

খোলাসাতুল কোরআন/ মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী
ইসলাম ও মুক্তচিন্তা/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
গুনাহ থেকে বাঁচুন/ মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ.
মোগল পরিবারের শেষদিনগুলি/ খাজা হাসান নিজামী
তুরস্কে পাঁচ দিন/ ড. মুসতফা কামাল
সিরাতে রাসুল : শিক্ষা ও সৌন্দর্য/ ড. মুসতফা সিবায়ী রহ.
আমার ঘুম আমার ইবাদত/ আহমাদ সাব্বির
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত/ সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রহ.
বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত/ মাওলানা ইসমাইল রেহান

অভিব্যক্তি

প্রায়ই ভাইয়েরা প্রশ্ন করেন, তাদের কোনো ভাই বা বন্ধু দীনের দিকে ঝুঁকছেন, কোন বই পড়তে দেবেন? অনেক ভাইবোন কমেন্টে কুরআনের নানান প্রকাশনীর তরজমা সাজেস্ট করেন। কিংবা অনেক ভাই-ই দীনের পথচলা শুরু করেন কুরআনের তরজমা দিয়ে। নিঃসন্দেহে কুরআন-ই তো আমাদের চিন্তাচেতনার মূলকেন্দ্র, মূলসূত্র। কিন্তু দীনের জ্ঞান অর্জন কুরআন দিয়ে শুরু করার ব্যাপারে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

আমার একজন পরিচিত ব্যক্তি। হজ করে এসে দীনি জ্ঞান অর্জন শুরু করলেন। কিছুদিন পর কথায় কথায় আমাকে বললেন যে তিনি কুরআনের তরজমা পড়ছেন। মহর আর যৌনকর্মীর পারিশ্রমিকের মধ্যে তিনি কোনো পার্থক্য খুঁজে পেলেন না।

আরেকজন কাছের মানুষ, কুরআনের তরজমা দিয়ে যার দীনি পড়াশোনা শুরু। তার অনুভূতি হলো বর্তমান ইসলাম হলো উগ্রবাদ, মোল্লাদের তৈরি। কুরআনের ইসলাম এতো কঠিন না। এরকম বহু নজির আপনার আশেপাশেই পাবেন। সব ভ্রান্ত ফিরকা নিজেদের মতো করে কুরআন থেকেই দলিল দেয়। আবার শুধু কুরআনের উপর ভিত্তি করে ভ্রান্ত দলের অস্তিত্বও আমাদের অজানা নয়। আচ্ছা, কেন এমন হয়! সাহাবায়ে কেরামের প্রথম শিক্ষা তো কুরআনই ছিল, তারা তো বিভ্রান্ত হননি!

দুটো কারণ আছে এমন হবার—

এক. কুরআন বুঝিয়ে দেবার কাউকে থাকতে হবে। সাহাবিদের কুরআন বুঝিয়ে দিতেন খোদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এভাবে প্রতি প্রজন্মে এই বুঝ ট্রান্সফার হয়েছে। এই ধারাবাহিক কমন বুঝটার বাইরে নিজের মতো করে বুঝতে গিয়েই সমস্যাগুলো হয়েছে। একজনকে তো অবশ্যই থাকতে হবে, যিনি আমাকে এই আদি ব্যাখ্যা (নবীজি ও সাহাবিদের বুঝটুকু) বুঝিয়ে দেবেন। এটা সত্যি যে, ব্যস্ততার দরুন এমন কারও কাছে বসে কুরআন পড়ে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

এর একটা সমাধান হতে পারে— কোনো সহজ তাফসির (ব্যাখ্যাসহ তরজমা) নেওয়া, এবং পড়ার সময় কোনো জায়গায় না বুঝলে টুকে রাখা। সেই জায়গাগুলো কোনো আলিমের কাছে সুবিধাজনক সময়ে বসে ক্লিয়ার করে নেওয়া। শুধু তরজমা পড়াকে এজন্যই নিরুৎসাহিত করা হয়। কারণ প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা ভালো না। আর দীনের 'পয়লা পাঠ' হিসেবে তো আমি সরাসরি নিষেধই করব।

কেন? এটাই আমাদের দ্বিতীয় কারণ। আমরা জেনারেল কারিকুলামে পড়াশোনা করেছি, যা ব্রিটিশ-প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা-কাঠামো। এই উপমহাদেশের ট্র্যাডিশনাল শিক্ষাধারাকে পরিবর্তন করে নতুন শিক্ষা প্রবর্তন করার সময় তাদের লক্ষ্য ছিল তৈরি করা 'এমন একটা শ্রেণি, যারা রক্তে-গায়ের রঙে তো ভারতীয়, কিন্তু রুচি-মতামত-নীতি-বিচারবুদ্ধিতে হবে ইংরেজ।'[১] ঠিক এই শ্রেণিটাই ইংরেজ খেদানোর পর ক্ষমতায় বসেছে, পলিসি করেছে, দেশ চালিয়েছে, বই লিখেছে। শুধু এরাই শিক্ষিত শ্রেণি, বাকিরা যেন গণ্ডমূর্খ। ফলে ইংরেজ চলে গেলেও, ইংরেজের রুচি-মত-নীতি-বিচারবুদ্ধিতেই আমরা উঠছি-বসছি-চলছি-ফিরছি-শিখছি। জেনারেশনের পর জেনারেশন আমরা বেড়ে উঠছি 'রঙে ভারতীয় ঢঙে ইংরেজ' হয়ে। আর ইংরেজদের এবং ইউরোপীয়দের চিন্তাচেতনার উৎস হলো গ্রিকদের বিশ্বদর্শন আর রোমানদের সমাজ-রাষ্ট্রবোধ। ১৪শ শতকে রেনেসাঁর সময় থেকে শুরু হয় খ্রিষ্টধর্মের খোলস থেকে বেরিয়ে আসার এই প্রক্রিয়া, শেষ হয় ১৮শ শতকে এনলাইটেনমেন্টে এসে। স্বাধীনতা-সমতা-নৈতিকতা-নিরপেক্ষতা-প্রকৃতিবাদ এসব চিন্তাদর্শন দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে তারা উপনিবেশের মওকায়। এগুলো শিখিয়ে তৈরি করেছে সেই শ্রেণি, যারা চিন্তা-মননে ইউরোপীয়। সেই শ্রেণিটাই আমাদের বাবাদের চিন্তা গড়ে তুলেছে, তারা আমাদের। প্রজন্মান্তরে আমরা সেই চিন্তাধারাই বহন করি, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।

---

[১] ১৮৩৪ সালে ভারতে শিক্ষাপ্রসারের জন্য কমিটি করা হয়। এর প্রধান ছিলেন লর্ড ম্যাকলে। স্কিমের রিপোর্ট- Minute on Indian Education, 2nd February, 1935; Thomas Babington Macaulay, point 12

এই চশমা পরে যখন কেউ কুরআন পড়ে, তখন একের পর এক প্রশ্ন জাগতে থাকে মনে। কেন মেয়েরা আদ্ধেক সম্পত্তি পেল? কেন মেয়েদের সাক্ষ্যের দাম ছেলেদের অর্ধেক? কেন আল্লাহ যুদ্ধ করতে বললেন? কেন চার বিয়ের অনুমতি? কেন দাসদাসীর বিধান? কেন এই, কেন সেই? স্বাভাবিক। কেননা এই ইউরোপীয় মানদণ্ড প্রতি গিঁটে গিঁটে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এই ইউরোপীয় মূল্যবোধ বা ধারণাগুলোকে ওরা আমাদের 'চূড়ান্ত' 'ধ্রুব' 'সর্বৈব সত্য' 'নিপাতনে সিদ্ধ' ভাবতে শিখিয়েছে।[২] ফলে আল্লাহর দেওয়া দীন, আল্লাহর স্ট্যান্ডার্ডকে আমাদের কাছে বর্বর মনে হয়, মধ্যযুগীয় মনে হয়, সেকেলে মনে হয়। দুটো মাপকাঠির পার্থক্যটা দেখুন। একটা হলো গ্রিক-রোমান প্যাগানদের চিন্তাদর্শন 'নতুন বোতলে পুরোনো মদ'। আর একটা হলো স্বয়ং স্রষ্টা স্বয়ং অধিপতি পালনকর্তার প্রদত্ত, যিনি মানবমন-মানবসমাজ-মানবদেহের গতিপ্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। অথচ আজ আমরা মানবদর্শনের স্কেলে প্রশ্ন করছি আল্লাহর সিদ্ধান্তকে। আজ ইসলাম নিয়ে নাস্তিকদের যত প্রশ্ন, মডার্নিস্ট রিভিশনিস্ট মডারেট মুসলিমদের যত হীনম্মন্যতা সব কিছুরই উৎস এই পাশ্চাত্য মাপকাঠি ও পাশ্চাত্য ধারণাগুলোকে 'চূড়ান্ত' ঠাওরানোর প্রবণতা থেকে। এটাই সব প্রশ্নের, সব আপত্তির উৎস।

কুরআন থেকে হেদায়েত পেতে হলে সবার আগে এই ব্রিটিশ-ওয়াশ মগজখানি কাউন্টার ওয়াশ দিয়ে নিউট্রালে আনতে হবে। পশ্চিমা ভৌতবিজ্ঞান যেমন প্রমাণনির্ভর, তাদের সামাজিকবিজ্ঞান তেমন প্রমাণিত কোনো জিনিস না; বরং তা মতাদর্শনির্ভর। নিউটনের বলবিদ্যার সূত্র যেমন, পশ্চিমী অর্থনীতি-রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সমাজবিজ্ঞানের ধারণাগুলো তেমন প্রশ্নাতীত বিষয় না। তাদের পুরো সামাজিকবিজ্ঞান

[২] Perennialism দর্শন। 'For Perennialists, the aim of education is to ensure that students acquire understandings about the great ideas of Western civilization. These ideas have the potential for solving problems in any era. The focus is to teach ideas that are everlasting, to seek enduring truths which are constant, not changing, as the natural and human worlds at their most essential level, do not change.' [Philosophical Perspectives in Education, Oregon State University ওয়েবসাইট]

দাঁড়িয়ে আছে একটা সংজ্ঞার উপর—ব্যক্তি, হিউম্যান। human, person, individual— এগুলোর দার্শনিক যে সংজ্ঞা, তার উপরেই পরিবারের সংজ্ঞা, সমাজের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, অর্থনীতির সংজ্ঞা, আইনের সংজ্ঞা, অধিকার-স্বাধীনতা-সমতা-নৈতিকতা সবকিছুর ধারণা। পুরো পশ্চিমা সভ্যতা এর উপর দাঁড়িয়ে আছে, তাই পশ্চিমা চিন্তা-মনন বুঝতে হলে এই human-এর সংজ্ঞাটা বুঝতে হবে। humanity আর humanism-এর পার্থক্যটা জানতে হবে। এই ধারণাটা বুঝে নিলেই ইসলাম নিয়ে এতো এতো প্রশ্ন কোত্থেকে আসে, চট করে ধরে ফেলা যাবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যে সেক্যুলার লিবারেল মূল্যবোধকে 'প্রশ্নাতীত' হিসেবে, ধর্মীয় অনুশাসনের মতো 'প্রশ্ন ওঠানো ট্যাবু' হিসেবে মন-মগজে গেঁথে দেওয়া হয়েছে; বিভিন্নভাবে মেনে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে—তা ধরা দেবে উপলব্ধিতে।

একজন ব্রিটিশ-ওয়াশ মুসলিমকে প্রথম কোন বইটা দেওয়া যায়, সে ভাবনা আর নেই। উসতায ইফতেখার সিফাত হাফিজাহুল্লাহকে দিয়ে আল্লাহ সেই কাজটুকু নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে একজন জেনারেল শিক্ষিত মুসলিমের পড়া প্রথম বই হওয়া উচিত এই 'হিউম্যান বিয়িং' বইটি। যাতে তিনি নিজেকে চিনতে পারেন— আমি পশ্চিমা 'হিউম্যান' নাকি আল্লাহর 'আবদ'? 'কোন পরিচয়ে আমি কবরে যেতে চাই'? এটা তো সেই আত্মজ্ঞান, যা একজন মুসলিমের প্রয়োজন হয় তার বালেগ হবার সাথে সাথে। আর একজন নওমুসলিমের প্রয়োজন হয় কালিমা পড়ার পরপরই। আল্লাহর দেওয়া নৈতিকতা অস্বীকারকারী 'হিউম্যান' হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চাই নাকি আল্লাহর দেওয়া নৈতিকতা মেনে তার দাস হিসেবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে চাই? এ সিদ্ধান্ত তো আমাকে কুরআন পড়ার আগেই নিতে হবে। তাই আমি প্রত্যেক মুসলিম ভাইকে অনুরোধ করব, নিজে পড়ার সাথে সাথে প্র্যাক্টিসিং-গাফেল সবার হাতে কীভাবে এই বই পৌঁছানো যায়, সেই ফিকির করি সবাই।

আর নাস্তিকদের প্রশ্নে আমরা শাখাগত জবাব দিয়ে দায়মুক্ত হই। ধরুন, একজন জিজ্ঞেস করল নবীজি এতো বিবাহ করেছেন কেন... (খিস্তিখেউড়)? শুধু এই প্রশ্নের জবাব পেলেই কি সে মুসলিম হয়ে যাবে? তার ক'টা প্রশ্নের জবাব দেবেন আপনি? নাকি ভালো হয় তার

প্রশ্নের উৎসমুখে একটা পাথর বসিয়ে দিলে? তা হলে এই বইটিই সেই পাথর। সে যে 'সেক্যুলার লিবারেল হিউম্যানিজম' ধর্মে বিশ্বাসী, সেই ধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করলেই বাকি কাজ সহজ। উসতায ইফতেখার সিফাতকে আল্লাহ উত্তম জাযা দান করুন। আমার এখানে খুব একটা কাজ নেই বার-দুয়েক রিডিং পড়া আর টুকটাক রেফারেন্স জুড়ে দেওয়া ছাড়া। আল্লাহ, এই অসিলায় আমাকে মাফ করে দিন।

আর আমার-লেখকের-পাঠকের-সংশ্লিষ্ট সকলের হেদায়েতের মাধ্যম হোক 'হিউম্যান বিয়িং' বইটি।

শামসুল আরেফীন

৩০.৬.২০২০

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নিশ্চয় সকল তারিফ কেবল তার, যিনি আমাদের দীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়ে বাইরের সব কিছুকে জাহিলিয়্যাত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যিনি সমাজ থেকে জাহেলি সভ্যতাকে দূর করে আল্লাহর উলুহিয়্যাতের সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আরো রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার ও সাহাবিদের উপর, যারা ইসলামি সভ্যতাকে বিশ্বব্যাপী বিস্তার করেছেন এবং এই পথে নিজেদের কুরবান করেছেন।

পশ্চিমাবিশ্ব যে ইসলামের সাথে এক সামগ্রিক লড়াইয়ে লিপ্ত একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই বিষয়ে কোনো মুসলিমের সন্দেহ থাকার কথা নয়। এই দ্বন্দ্ব সভ্যতার দ্বন্দ্ব। পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্ব-নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করার পর নিজেদের জন্য একমাত্র হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পরাজিত করে বিশ্ব-নেতৃত্ব গ্রহণ করার একমাত্র শক্তি ইসলামি সভ্যতার ভিতরেই আছে। ফলে পশ্চিমাবিশ্ব ইসলামের বিরুদ্ধে এক সামগ্রিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। সামরিক আগ্রাসনের পাশাপাশি এই যুদ্ধের আরো ভয়াবহ দিক হলো আদর্শিক আগ্রাসন, যাকে বলা যায় মনস্তাত্ত্বিক লড়াই।

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব। এই টপিকে অনেক ইসলামি চিন্তাবিদই বই লিখেছেন। বিগত শতাব্দীতে যারা এই বিষয়ে কাজ করেছেন, তাদের কাজগুলো তাদের সময়ের জন্য বর্তমানের তুলনায় বেশি প্রাসঙ্গিক ছিল। কারো লেখার ধরন ছিল পশ্চিমা দার্শনিকদের থিউরিসমূহের খণ্ডন, আবার কেউ কেউ তখনকার সমাজ-বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের সংঘাতকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমাদের সামনে দুটি সংকট এসে হাজির হয়েছে।

প্রথমত, মুসলিমবিশ্বের পরাজিত মানসিকতা, হীনম্মন্যতা কিংবা পাশ্চাত্য-মুগ্ধতা সীমাহীন বৃদ্ধি পাওয়া। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে মুসলিমবিশ্বের আপস এবং পাশ্চাত্যকে ইসলামিকরণের প্রচেষ্টা জোরদার হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রথমে উল্লেখকৃত সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে সমসাময়িক যেই বয়ান তৈরি করার প্রয়োজন ছিল, সেই জায়গাটায় বিরাট শূন্যতা রয়ে যাওয়া। অন্ততপক্ষে বাংলাভাষায় এই শূন্যতার কথা অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই। আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান এমনটাই।

প্রথম সংকটকে আমরা মডারেশন হিসেবে জানি। এটা মুসলিম-সমাজে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কীভাবে এবং কাদের মাধ্যমে এই সংকট দিন দিন বেড়েই চলছে- বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র রচনার দাবি রাখে। ফলে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে প্রথম সংকট নিয়ে আলোচনা থাকবে না। আমাদের আলোচ্য বিষয়, দ্বিতীয় সংকট। বর্তমান সময়ের ইসলামি স্কলারগণ প্রথম সংকট মোকাবিলা করার চেষ্টা করেননি, ব্যাপারটা মোটেই এমন নয়। তারা চেষ্টা করলেও পাশ্চাত্য সভ্যতা নিয়ে তাদের জানাশোনার একটা কমতি আছে। ফলে অধিকাংশই একদম জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলোতে হোঁচট খেয়েছেন। প্রতিরক্ষার জায়গা থেকে লিখতে গিয়ে অনেক সময় ইসলামের আপসহীন দাসত্বের বাণী থেকে সরে এসেছেন কিংবা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। পাশ্চাত্যের মূলকে না জানার পাশাপাশি সমাজ-বাস্তবতায় পাশ্চাত্যের প্রভাব অনুধাবন করারও অক্ষমতা তৈরি হয়েছে। যে বিষয়টি আসলে পাশ্চাত্যের প্রভাব সেটা আমাদের কাছে কোনো সমস্যারই মনে হচ্ছে না। বরং এটাকে আমরা গৌরবের কারণ বানিয়ে নিয়েছি। ফলে পাশ্চাত্যবিরোধী বক্তব্যেও পশ্চিমের ভয়াবহ প্রভাব লক্ষ করা যায়। সমস্যার মূল যখন চিহ্নিত হবে না তখন সমাধানও ভুল আসবে। এটাই নিয়ম। আর হচ্ছেও তাই। 'বাতিল যেভাবে আসবে তাকে সেভাবেই মোকাবিলা করতে হবে' এমন সরল-সোজা যুক্তির মারপ্যাঁচে পশ্চিমা সভ্যতাকে বরণ করে নেওয়ার সবক দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তারা ভুলে যায় হক এবং বাতিলের বিভাজন শুধু নামেই নয়, বরং উভয়ের মাঝে কাঠামোগত বিস্তর ফারাক রয়েছে। বাতিল যে পথে উন্নতি করবে হক সে পথে উন্নতি করতে পারবে না। বরং সে পথে হক বাতিলের সাথে একাকার হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কেউ আবার বিজ্ঞানকে মুসলিম সভ্যতার একমাত্র ভরসা বলে দাবি করছে; অথচ বিজ্ঞান কোনো সভ্যতার উত্থানের সূত্র নয়, ফলমাত্র। উপর্যুক্ত বাস্তবতাগুলো সামনে রেখেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে পাশ্চাত্যের মূল কাঠামো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা যেই ভিত্তিমূলের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোর ব্যাপারে ইসলামের শাশ্বত দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে পাশ্চাত্যের মোকাবিলায় মৌলিকভাবে করণীয় সম্পর্কে একটি উপসংহার যুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই লক্ষ করেছি, ইসলামের দৃষ্টিতে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে কোন হিসেবে নামকরণ করা যায় এবং ইসলাম সেই সমস্যার কী সমাধান দিয়েছে। ব্যাপারটা অনেকের কাছে অতি সরলীকরণ মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের মুক্তির পথ এখানেই নিহিত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ খুব সুন্দর বলেছেন, 'বিজয়ের জন্য প্রয়োজন পথপ্রদর্শক কিতাব এবং সাহায্যকারী তরবারি।'

এই বইকে মৌলিক বা অনুবাদ কিংবা সংকলন এককভাবে কোনোটাই বলা যায় না। কারণ এখানে তিন ধরনের লেখারই সংমিশ্রণ ঘটেছে। তবে বিন্যাসের দিক থেকে এক ধরনের মৌলিকত্ব রয়েছে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে হাসান আসকারি রহিমাহুল্লাহর 'জাদিদিয়্যাত' বইটির অনুসরণ করা হয়েছে। ভূমিকা ও উপসংহার একেবারেই মৌলিক। মাঝখানের আলোচনাতে মৌলিক লেখার পাশাপাশি ড. জাবেদ আকবার আনসারী, ড. যাহিদ সিদ্দিকী মুগল এবং প্রফেসর মুফতি মুহাম্মদ আহমাদ- তাদের লেখা থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। এর মধ্যে ডক্টর মুগল সাহেবের 'ইসলামি ব্যাংকারি আওর জমহুরিয়্যত'[৩] ও 'মাকালাতে তাহজিবে মাগরিব' এবং মুফতি আহমাদ সাহেবের 'তাআরুফে তাহজিবে মাগরিব' উল্লেখযোগ্য।।

মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব অনেক বিস্তৃত। এমনকি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা আচরণ, কথাবার্তা ও কর্ম-কৌশলের সাথে পাশ্চাত্য চিন্তাচেতনার সংশ্লিষ্টতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বলা যায়,

[৩] বইটির প্রথম অংশ 'আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে লেখা। ইতিমধ্যে এই অংশটি ইলমহাউজ পাবলিকেশন থেকে 'ইসলামী ব্যাংক : ভুল প্রশ্নের ভুল উত্তর' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

খুবই ব্যাপক একটি বিষয়। তাই বিন্যাসের ক্ষেত্রে লেখা সংক্ষিপ্ত হলেও বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তিকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের মূল বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সাংঘর্ষিক অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে। আর আলোচনার মাঝে মাঝে সংশ্লিষ্ট নানান বাংলা বইয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেন পাঠক এই বিষয়ে বিস্তারিত পড়াশোনা করার জন্য একটি ফুল প্যাকেজের সন্ধান পান।

বইটির পিছনে অনেক ভাইয়ের শ্রম ও সহযোগিতা রয়েছে। তাদের সবার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বইটি যেন আল্লাহর কাছে মাকবুল হয়, উম্মাহর বিশুদ্ধ চিন্তা গঠনে সহায়ক হয় এবং একবিংশ শতাব্দীর জাহেলি সমাজকে ভেঙে ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে সামান্য হলেও ভূমিকা রাখে- এটাই প্রত্যাশা। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের খেদমাত কবুল করে নিন। আমিন।

ইফতেখার সিফাত
২৯ জিলহজ ১৪৪১

সম্পাদকীয়

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা অতীতের বিভিন্ন সভ্যতার আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে কওমে আদ, সামুদ, সাবা এবং নিকট অতীতের রোম সভ্যতার আলোচনা উল্লেখযোগ্য। সমকালীন প্রেক্ষাপটে এসব সভ্যতার বেশ বাহ্যিক উন্নতি ছিল। তারা নিছক আমোদ-ফুর্তি বা যশ-খ্যাতির জন্যই বড় বড় ভবন নির্মাণ করত এবং তাদের যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা এতটাই উন্নত ছিল যে, তা দেখে মনে হতো তারা এর চেয়ে উন্নত কোনো শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু কুরআনুল কারিমে এসব সভ্যতা নিয়ে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা ছিল তাদের আকিদা-বিশ্বাসের স্বরূপ তুলে ধরা, বাহ্যত এতো উন্নতির পরেও যা তাদের ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তাই কুরআন খুবই গুরুত্বের সাথে তাদের আকিদা-বিশ্বাসগুলো তুলে ধরেছে। যে চিন্তাচেতনার উপর তাদের সভ্যতার ভিত রচিত হয়েছে, কুরআন সেগুলো বিস্তর বর্ণনা করেছে।

আলোচিত সভ্যতাগুলো মৌলিকভাবে সৃষ্টি, স্রষ্টা, জীবন-জগতের শুরু-শেষ, মানুষের পুনরুত্থান ও বিচারদিবস এসব বিষয়ে অবিশ্বাসী ছিল। তারা মনে করত এই বিশাল জগত কারো সৃষ্টি নয়, এগুলো ঘটনাক্রম এবং জীবনমাত্র একটাই। এই ইহজগতের পর আর কোনো জীবন নাই, যেখানে মানুষ কোনো প্রতিপত্তিশালী স্রষ্টার সামনে হিসাবের সম্মুখীন হবে। তারা বলত- আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। 'আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা (কখনো) পুনরুত্থিত হবো না' (মুমিনুন-৩৭)। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পরিবর্তে তাদের মধ্যে যারা দীনে হকের চরম বিরোধী ও উদ্ধত চরিত্রের অধিকারী ছিল, তাদের আদেশ-নিষেধই পালন করত। '(তারা) উদ্ধত বিরোধীদের আদেশ পালন করেছে' (হুদ-৫৯)। ফলে তাদের ধ্বংস ছিল অনিবার্য। 'অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে তারা সকালবেলায় নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল' (আরাফ-৭৮)।

এই অবিশ্বাস তাদের এতটাই স্বেচ্ছাচারিতার প্রণোদনা দিয়েছিল যে, তারা এক সীমাহীন অনৈতিক সমাজ গড়ে তুলেছিল। সেখানে সত্য ও নৈতিকতার প্রতি আহ্বানকারীদের বলা হতো গোঁড়া ও সেকেলে। ঠাট্টা করা হতো এই বলে যে, 'তুমি তো দেখছি বিরাট সাধু' (আরাফ ৮২)! সত্য ও মিথ্যা, ভালো-মন্দ ও পাপ-পুণ্য নির্ধারণ করত তাদের মন, তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ফলে তারা একেকজন হয়ে উঠেছিল চিন্তায় আল্লাহর দাসত্বমুক্ত এক সত্তা। নিজেরাই হয়ে উঠেছিল নিজেদের রব।

যেকোনো সভ্যতার বুনিয়াদ হলো আকিদা ও ধর্মবিশ্বাস। এবং সমস্ত সভ্যতাই তা ছোট হোক বা বড়, দীর্ঘমেয়াদি হোক বা স্বল্পমেয়াদি, তা গড়ে ওঠে একটি বিশ্বাসগত কাঠামোর উপর। কোনো সভ্যতার আকিদা-বিশ্বাস যদি গভীর থেকে উপলব্ধি করা যায়, তা হলে দূর থেকেও খুব সহজেই সে জাতির জীবনের ছক পূরণ করা যায়। তাই কোনো সভ্যতা তা বাহ্যত যতই উন্নত হোক, তার মূল্যায়ন হবে তার আকিদা-বিশ্বাস দিয়ে। কুরআন অতীতের সভ্যতাগুলোকে এভাবেই মূল্যায়ন করেছে। যাতে কুরআনের অনুসারীরা কোনো আধুনিক সভ্যতার বাহ্যত উন্নতি ও অন্তরীণ বিজয় দেখে নিজেদের প্রতারিত না করে; বরং যেন তার হাকিকত সম্পর্কে খোঁজ নেয়, সভ্যতাকে বোঝে এবং সে বিষয়ে ঈমানি দিক থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

স্পেনে মুসলিমদের পতনের পর পর্যায়ক্রমে নানা আন্দোলন ও সংস্কার পাড়ি দিয়ে বিগত কয়েক শতক থেকে ইউরোপ-আমেরিকার যৌথ আকিদা-বিশ্বাস, পরস্পর অর্থায়ন ও সাংস্কৃতিক মিলনের বদৌলতে যে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি ও জয়জয়কার হয়েছে, আমরা একে পশ্চিমা সভ্যতা বলে জানি। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ইসলামের পর মানুষের জীবনে প্রভাব সৃষ্টিকারী এমন জাদুকরী কোনো সভ্যতার জন্ম হয়নি। হিউম্যান বিয়িং তথা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক এই জীবনব্যবস্থা বা সভ্যতার প্রধান আকর্ষণ হলো এর সহজতা এবং রাষ্ট্রকর্তৃক ব্যক্তিকে তার সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বেচ্ছাচারিতার অনুমোদন দেওয়া। মানুষের জন্য এরকম সহজ ও সাধারণ ভিত্তি, এবং মানুষের সকল প্রকার চাহিদা পূরণকারী দ্বিতীয় কোনো সভ্যতা নেই। এতে কোনো গভীরতা, কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি এবং কোনো ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রয়োজন নেই। তাই সাধারণ

মানুষের নিকট এটি খুবই আকর্ষণীয় এবং মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এর চেয়ে অধিক পৌন:পুনিক জয়লাভকারী কোনো সভ্যতা বা জীবনব্যবস্থা দেখা যায়নি।

এই সভ্যতা তার উত্থান ও বিজয়কালে গভীর থেকে মুসলিমদের প্রভাবিত করে। তাদের সমস্ত চেতনা, দীনি আদর্শ ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে পরাজিত করবার চেষ্টা চালায়। অনেক ক্ষেত্রে তা সফলও হয়। বিশেষত আজ পশ্চিমা সভ্যতা মুসলিম-মানসে সত্য, মিথ্যা ও নৈতিকতার এমন মানদণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে যে এর বিকল্প ভাবাকে মনে করা হয় অপরাধ। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, পশ্চিমা সভ্যতার বাহ্যিক আয়োজনের সাথে সাথে তাদের আকিদা-বিশ্বাসগুলোও আজ মুসলিম-মানস দখল করে নিয়েছে। প্রায় প্রতিটি কাঁচা-পাকা ঘরই এই সভ্যতার প্রতীক বা সিম্বলে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতার দর্শন ও আদর্শগত প্রভাবে দীর্ঘদিন থেকেই ইসলামি পৃথিবীর সামনে নতুন এক ইরতিদাদের সয়লাব ঘটেছে, যা ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক থেকে এ যাবতকালের সমস্ত ইরতিদাদি ফেতনাকে ছাড়িয়ে গেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- এই সভ্যতা আলাদা ধর্মের দাবি না করেও গোপনে একটি নতুন ধর্মের স্থান দখল করে নিয়েছে, যাকে নির্ভুল, অকাট্য, অলঙ্ঘনীয় ভাবা হয়। এই সভ্যতার কোনো একক প্রতীক নেই। তবে এর অনেকগুলো মোহনীয় পরিভাষা আছে, আছে ইতিহাসও। আবার এই সভ্যতা থেকেই তৈরি হয়েছে অনেক ইরতিদাদি মতবাদ। তাই এই সভ্যতাকে জানা এবং এর পরিধি হাতে-কলমে বুঝা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ছিল একান্ত কর্তব্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এ বিষয়ে সচেতন মুসলিম সমাজেরও খুব একটা দৃষ্টি পড়েনি।

মুহতারাম ইফতেখার সিফাত এই বইয়ে পশ্চিমা সভ্যতার ভেতর-বাহির নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাদের আকিদা, বিশ্বাস, দর্শন, পরিভাষাগত জটিলতা এবং ইতিহাস ও তার উৎসগুলো বেশ চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। পশ্চিমা সভ্যতার বুনিয়াদি বিশ্বাস কেন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সে বিষয়ে দলিল পেশ করেছেন দীনে ইলমের উৎস ও বাস্তবতার নিরিখে। একইসাথে তিনি পশ্চিমা সভ্যতার ভিত হিউম্যান বিয়িং ও তার ইতিহাস থেকে জন্ম নেওয়া স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির

স্বরূপ ও এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন এই সভ্যতার মানবিক হয়ে ওঠার পেছনের অসারতাগুলো। তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে পশ্চিমা সভ্যতার বেঁধে দেওয়া মানদণ্ডকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে সব কিছুকে মূল্যায়ন করার; বিশেষত ইসলামের আহকাম ও বিধানকে মূল্যায়ন করার যে প্রবণতা তাকে চিহ্নিত করেছেন। খুব গভীর থেকে দেখিয়েছেন কীভাবে একটি মুসলিম-মানস পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারা প্রতারিত হয় এবং আখেরে নিজের ঈমান আমল হারিয়ে বসে। পাশাপাশি হাজারো বাহ্যিক উন্নতির পরেও বিশ্বাস ও বিকৃতির ফলে একটি সভ্যতা কীভাবে মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় সে দিক নিয়েও পেশ করেছেন গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা।

পশ্চিমা সভ্যতাকে বুঝার জন্য নানা দিক থেকে কাজ হলেও পুরো বিষয়টাকে একসাথে এত সুন্দর উপস্থাপনাকে বিরলই বলতে হবে। আশা করছি বাংলাভাষী পাঠকের জন্য বইটি খুবই উপকারী হবে। বিশেষত যারা বুদ্ধিবৃত্তিক দাওয়াতের ময়দানে কাজ করেন এবং সমাজের নানা আঙ্গিক, সময়ের শ্রোত ও আধুনিক চিন্তার নামে বহমান ইরতিদাদের ফেতনা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য। আল্লাহ আমাদের এই ইরতিদাদি সভ্যতা থেকে বাঁচার তাওফিক দিন। লেখক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। এ বইকে মানুষের হেদায়েতের অসিলা বানান। আমিন।

মুহাম্মাদ আফসার

সূচিপত্র

ভূমিকা : ২৫
পরিভাষার চোরাবালি : ৩৮
আধুনিক পশ্চিমের শেকড় : ৪৪
গ্রিক সভ্যতা : ৪৪
সাংস্কৃতিক তৎপরতা : ৪৬
রোমান সভ্যতা : ৪৭
রোমান সংস্কৃতি : ৪৮
গণতান্ত্রিক সিস্টেম : ৪৮
মধ্যযুগ : ৪৯
রেনেসাঁ বা নবজাগরণ (আধুনিকতার সূচনা) : ৫২
যুক্তিবাদ : ৫৩
নিউটনের ভ্রান্তি : ৫৪
ব্যক্তি ও সমাজের অবস্থান : ৫৪
ফরাসি বিপ্লব : ৫৫
ঊনবিংশ শতাব্দী : ৫৬
তুলনামূলক ধর্মপাঠ : ৫৯
উপনিবেশবাদ : ৬০
বিংশ শতাব্দী : ৬৪
পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্টি : ৬৬
১.১ স্বাধীনতা : ৬৭
১.২ স্বাধীনতার ইসলামি দৃষ্টিকোণ : ৬৯
১.৩ স্বাধীনতার ইসলামিকরণ : ৭১
২.১ সমতা : ৭৩
২.২ ইসলামের দৃষ্টিতে সমতা : ৭৪

২.৩ সমতার ইসলামিকরণ : ৭৬
৩.১ উন্নতি : ৭৭
৩.২ ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নতি : ৭৯
পাশ্চাত্যের কিছু মতবাদ : ৮২
ফেমিনিজম বা নারীবাদ : ৮২
ইন্টারফেইথ : ৮৯
মুক্তচিন্তা : ৯১
হিউম্যানিজম : আইন ও অথরিটি : ৯৩
হিউম্যানিজম : মুসলমান নাকি মানুষ? : ৯৬
হিউম্যানিজম কি নিরপেক্ষ হতে পারে? : ১০১
হিউম্যান রাইটস এবং হুকুকুল ইবাদ-এর পার্থক্য : ১০৪
ইসলাম বনাম সেক্যুলারিজম : ১০৯
সেক্যুলারিজম : ১১১
ইসলামি দৃষ্টিকোণ : ১১৭
টলারেন্সের ইসলামিকরণ : ১২১
সেক্যুলারিজমের ইসলামিকরণ : ১২৮
ল' অফ পিপলস : ১৩৫
ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিম : ১৩৮
ট্রাডিশনালিস্ট মুসলিম : ১৩৮
মডারেট মুসলিম : ১৩৯
সেক্যুলারিস্ট মুসলিম : ১৪১
উপসংহার : ১৪৩

হিউম্যান বিয়িং

শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব

ভূমিকা

এক

ইসমাহ বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাচ্যের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, পাশ্চাত্যের ফেতনা কেমন হবে? তিনি বললেন, তা তো হবে আরো অধিক ভয়ংকর।[৪]

উল্লিখিত হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশ্চিমের যেই ভয়ংকর ফেতনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, হতে পারে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাই সেই ফেতনা। তবে আল্লামা ইউসুফ বানুরি রহিমাহুল্লাহ হাদিসে উল্লেখিত পশ্চিমের ফেতনা বলতে মুসতাশরিকদের[৫] ফেতনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ এটা একটা পশ্চিমা ইলমি ফেতনা, যার প্রভাবে আজ পৃথিবী ইরতিদাদ ও ইলহাদে[৬] সয়লাব হয়ে গেছে।[৭]

---

[৪] মু'জামে তাবারানি, হাদিস নং ৫০১; হাইসামি রহ. বলেছেন বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

[৫] মুসতাশরিক মানে প্রাচ্যবিদ। ইংরেজি ভাষায় ওরিয়েন্টিলিস্ট বলা হয়। প্রাচ্যবিদ তাদেরকে বলে, যারা প্রাচ্যবাদের চর্চা করে। আর প্রাচ্যবাদ মূলত একটি পশ্চিমা আইডোলজি। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামসংক্রান্ত পূর্বপরিকল্পিত কিছু ধ্যানধারণার প্রচার করা। তা ইসলামি শিক্ষার সাথে মিলতেও পারে আবার নাও মিলতে পারে।

প্রাচ্যবাদ-গবেষক এডওয়ার্ড সাঈদ বলেন, 'প্রাচ্যবিদ্যা বলতে আমরা এটাও বুঝে নিতে পারি যে, এটা হচ্ছে পাঠসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি বোর্ড। এই বোর্ডের কাজ হচ্ছে প্রাচ্যের লোকদের সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করা। তাদের করণীয় নির্ধারণ করে দেওয়া। তাদের মাইন্ড কন্ট্রোল করা। তাদের উপর নিজেদের মানসিক আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়া।'

(প্রাচ্যবাদ সম্পর্কে জানতে আল্লামা মুস্তফা সিবায়ী রহ. এর 'আল-ইসতিশরাক ওয়াল মুসতাশরিকুন' বইটি পড়া যেতে পারে। পাশাপাশি এডওয়ার্ড সাঈদের 'ওরিয়েন্টালিজম' বইটিও পড়া উপকারী হবে।)

[৬] জরুরিয়াতে দীনের স্বতঃসিদ্ধ ব্যাখ্যা পরিবর্তন করে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করে কুফুরের দিকে পরিচালিত করা কিংবা কোনো কুফুরকে ইসলামি করার অপচেষ্টাকে ইলহাদ বলে। (ইকফারুল মুলহিদীন)

[৭] দাওরে হাজের কে ফেতনে, পৃষ্ঠা-৯৮